প্রাচীন ন্যায় দর্শনে সংশয় : একটি সমীক্ষা

সৌমেন রায়, পাপিয়া গুপ্ত

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় দর্শনে প্রসিদ্ধ ষড় আস্তিক দর্শনের অন্যতম ন্যায়দর্শন প্রমাণশাস্ত্র রূপে পরিচিত হলেও তা অপবর্গ বা মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ রূপে গ্রহণ করেছে। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি স্বরূপ এই অপবর্গের প্রাপ্তি প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম প্রমাণাদি ষোড়ষ প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন, যার অন্যতম তৃতীয় পদার্থটি হল সংশয়। আলোচ্য নিবন্ধে মূলতঃ প্রাচীন ন্যায়ের আঙ্গিকে সংশয়ের লক্ষণ, স্বরূপ ও পরীক্ষা সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং তৎসহ সংশয়ের প্রয়োজনীয়তা বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

বীজশব্দ: নিঃশ্রেয়স, অপবর্গ, সংশয়, তর্ক, অনধ্যবসায়।

ভারতীয় দর্শনে জগৎ, জীবন ও পরম সত্যের উপলব্ধি বিচিত্র ও বহুমুখী। এই বহুমুখী উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনে আবির্ভূত হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়গুলি প্রধানত আস্তিক-নাস্তিক ভেদে দ্বিবিধ এবং ন্যায় দর্শন ষড়বিধ আস্তিক দর্শনের মধ্যে অন্যতম। ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বুদ্ধিমান জীবের এমন কোন প্রয়োজনই নেই, যাতে এই ন্যায়বিদ্যা আবশ্যক নয়, ‘‘প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং। আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা’’।।[১] অর্থাৎ ন্যায়বিদ্যা যেহেতু অন্যান্য সমস্ত বিদ্যাকে প্রকাশ করে তাই এটি সর্ববিদ্যার প্রদীপস্বরূপ এবং যেহেতু, যে সমস্ত প্রমাণগুলি-কে ন্যায়বিদ্যায় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই প্রমাণগুলি অন্যান্য বিদ্যার প্রতিপাদ্য কর্মগুলিকে প্রকাশ করে থাকে তাই এটি যাবতীয় কর্মের উপায় স্বরূপও বটে। শুধু তাই নয়, ন্যায়শাস্ত্রই সমস্ত ধর্মের রক্ষাকারী বা সর্ব ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ। বস্তুত যেকোন শাস্ত্র বা বিদ্যারই মূল ধর্ম তথা প্রবণতা হল পুরুষকে কর্মের প্রতি প্রবৃত্ত করা, এই বিষয়টিও ন্যায়শাস্ত্রেই আলোচিত হয়েছে। এই ন্যায়শাস্ত্র প্রমাণশাস্ত্র রূপে পরিচিত হলেও, অপবর্গ বা মোক্ষই ন্যায়দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। নিঃশ্রেয়সকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে কিভাবে নিঃশ্রেয়স লাভ করা সম্ভব, তারই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে প্রাচীন ন্যায়দর্শনে। প্রসঙ্গক্রমে এইস্থলে প্রাচীন ন্যায়ে ‘নিঃশ্রেয়স’ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ঠিক কি অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, তার সামান্য আলোচনা প্রয়োজন। পাণিনীয় ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে অচতুরাদি সূত্রে নিঃশ্রেয়স শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করে বলা হয়েছে, ‘‘নিশ্চিতং শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়ম্’’ অর্থাৎ যা প্রকৃতই কাম্য তাই নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা গ্রহণযোগ্য। সাধারণত নিঃশ্রেয়স শব্দের দ্বারা ‘মুক্তি’ অর্থটি গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে কল্যাণ বা কাম্য অর্থেও যে শব্দটি গ্রহণ করা হয়, তার প্রয়োগ মহাভারতে দেখা যায়, ‘‘কচ্চিৎ সহস্রৈর্ম্মর্যাণামেকং ক্রীণাসি পন্ডিতম্। পন্ডিতো হ্যথকৃচ্ছেষু কুর্য্যান্নিঃশ্রেয়সংপরম্’’।।[২] অর্থাৎ সহস্রমানুষের মধ্যে তুমি একমাত্র পন্ডিতকেই ক্রয় করেছ। পন্ডিতই অর্থকষ্টের মধ্যেও নিঃশ্রেয়সংপর (কল্যাণকর) কার্য করেন। অতএব এখানে যে ‘নিঃশ্রেয়স’ শব্দটি মঙ্গল বা কল্যাণ অর্থেই গৃহিত হয়েছে তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। কিন্তু প্রাচীন ন্যায়ে মুক্তি বা অপবর্গ-কেই নিঃশ্রেয়স রূপে গণ্য করা হয়েছে, কারণ, ন্যায়বিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যা, তাই তার মুখ্য প্রয়োজন অপবর্গ এবং তার সাক্ষাৎ সাধন আত্মা ইত্যাদির তত্ত্বজ্ঞান। ন্যায়শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হল, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও তত্ত্বসংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ অপবর্গ লাভের পথ নির্দেশ করা। সুতরাং প্রাচীন ন্যায় মত অনুসারে, অপবর্গই চরম নিঃশ্রেয়স তথা ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন। মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রের দ্বারা যে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রকাশ করেছেন তা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা নয় বরং তর্কবিদ্যা সহিত অধ্যাত্মবিদ্যা। এই কারণেই প্রথম ন্যায়সূত্রের ভাষ্য শেষে

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন, "ইহত্বধ্যাত্মবিদ্যায়ামাত্মাদিজ্ঞানং তত্ত্ব-জ্ঞানং, নিঃশ্রেয়সাধিগমোঽপবর্গপ্রাপ্তিরিতি"[৩]। মহর্ষি গৌতম স্বয়ং এই বক্তব্য প্রকাশ করে বলেছেন,

"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানা-

নামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াপবর্গঃ"।।[৪]

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পর দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি (ধর্ম ও অধর্ম), দোষ (রাগ ও দ্বেষ) এবং মিথ্যাজ্ঞানের অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার ভ্রমজ্ঞানের ক্রমানুযায়ী নিবৃত্তি হলে, তবেই মুক্তি বা অপবর্গ হয়। 'অপবর্গ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, যাবতীয় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল অপবর্গ। বস্তুত অপ-পূর্ব্বক 'বৃজ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয়ের দ্বারা 'অপবর্গ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। জীবের সংসার বন্ধনের বর্জ্জন অর্থাৎ সংসারমূলক সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই এখানে অপ-পূর্ব্বক 'বৃজ'-ধাতুর অর্থ। এখন প্রশ্ন হল, এই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি স্বরূপ অপবর্গের প্রাপ্তি কিভাবে সম্ভব ? প্রাচীন নৈয়ায়িক মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে অপবর্গ লাভের উপায় নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলেছেন,

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-

হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"।।[৫]

অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন ইত্যাদি ষোল প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরায় মুক্তির কারণ। মহর্ষি উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী ষোল প্রকার পদার্থের মধ্যে তৃতীয় পদার্থটি হল সংশয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই সংশয় ইত্যাদি যে চতুর্দ্দশ প্রকার পদার্থের উল্লেখ মহর্ষি করেছেন, তা ন্যায়শাস্ত্রের পৃথক প্রস্থানরূপে বিবেচ্য। বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে, প্রস্থান হল কোন শাস্ত্রের অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়। এই প্রস্থান ভেদেই বিদ্যা বা শাস্ত্রের ভেদ সিদ্ধ হয়ে থাকে। এই প্রস্থান প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে,

"ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দন্ডণীতিঞ্চ শাশ্বতীং।

আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বর্ত্তরম্ভাংশ্চ লোকতঃ"।।[৬]

অর্থাৎ, ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, বার্ত্তা ও আন্বীক্ষিকী এই চারটি বিদ্যা মানবগণের হিতার্থে উপদিষ্ট হয়েছে। মনু উক্ত এই চারটি বিদ্যার পৃথক পৃথক প্রস্থান বর্তমান। বেদ বিদ্যার নাম ত্রয়ী। এই ত্রয়ী বিদ্যার প্রস্থান বা অসাধারণ প্রতিপাদ্য হল - বিভিন্ন প্রকার যাগ, হোম ইত্যাদি। কৃষি ইত্যাদি জীবিকা শাস্ত্রের নাম বার্ত্তা। এই বার্ত্তা বিদ্যার প্রস্থান বা অসাধারণ প্রতিপাদ্য হল - হলশকট ইত্যাদি। দণ্ডনীতি শাস্ত্রে দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড ইত্যাদির প্রয়োগরূপ আলোচনা বর্তমান। এই দণ্ডনীতি শাস্ত্রের প্রস্থান বা অসাধারণ প্রতিপাদ্য হল - রাজা, অমাত্য প্রভৃতি। আন্বীক্ষিকী অধ্যাত্মবিদ্যা এবং আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রস্থান তথা অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয় হল- সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থ। সুতরাং আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের বিশেষভাবে প্রতিপাদন কর্ত্তব্য। এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় প্রাচীন ন্যায় দর্শনে সংশয়ের স্বরূপ ও তার মূল্যায়ন। আলোচনার গভীরে প্রবেশের পূর্বে সংশয় দার্শনিক আলোচনার তথা পরীক্ষার ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ন্যায় দর্শনের মুখ্য প্রয়োজন অপবর্গের প্রসঙ্গে সংশয়ের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়, সে সম্পর্কে আলোকপাত করা আবশ্যক।

সংশয়-ন্যায়ের পূর্বাঙ্গ। পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ব, অবাধিতত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষত্ব ধর্মবিশিষ্ট হেতুর প্রতিপাদক প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যসমূহ হল ন্যায়। যে পদার্থ একেবারে অজ্ঞাত তাতে ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না, আবার যা একেবারে নির্ণীত তাতেও ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না। বরং যা সামান্যতঃ জ্ঞাত কিন্তু বিশেষরূপে অনির্ণীত সেখানেই ন্যায়ের প্রবৃত্তি। বিষয়টি দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা

করলে স্পষ্ট হবে। পর্বতকে জানি কিন্তু তাতে বহ্নি আছে কিনা - তা জ্ঞাত নয়। এইরকম সামান্যতঃ নির্ণীত কিন্তু বিশেষরূপে অনির্ণীত স্থলে, বিষয়টি যেরূপে যা অনির্ণীত সেইরূপেই তাতে সংশয় হয়। এইভাবেই সন্দিগ্ধ পদার্থেই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়। সংশয় কেবল ন্যায়-প্রবৃত্তিরই কারণ নয়, বরং সংশয় সকল প্রকার পরীক্ষার পূর্বাঙ্গ। কারণ, পরীক্ষা মাত্রের পূর্বে অবশ্যই সংশয় থাকে। এই সংশয়কে অবলম্বন করেই বাদী ও প্রতিবাদী কোন বিষয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হন। পরীক্ষা মাত্রই যে সংশয় পূর্বক - তার স্পষ্ট নিদর্শন, মহর্ষি গৌতম উক্ত নির্ণয় সূত্রে পাওয়া যায়। নির্ণয় হল তত্ত্বের অবধারণ। নির্ণয় প্রসঙ্গে ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে, সংশয় হওয়ার পরে বাদী ও প্রতিবাদীর নিজপক্ষ স্থাপন ও প্রতিপক্ষ খণ্ডনের দ্বারা মধ্যস্থ ব্যক্তির যে তত্ত্বের অবধারণ - তা নির্ণয়। বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ নিজ পক্ষে নিশ্চয় থাকলেও মধ্যস্থগণের আলোচ্য বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হলে, সেই সংশয় নিবৃত্তির জন্য বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। কারণ, মধ্যস্থগণের একপক্ষের নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সেই পক্ষের অনুমোদন করতে পারেন না। এইরূপস্থলে বাদী ও প্রতিবাদী স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খন্ডন করলে মধ্যস্থগণের যে একতরপক্ষের অবধারণ হয় তাই হল নির্ণয়। মহর্ষি গৌতম নির্ণয় নামক পদার্থের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন,

"বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ"।।[৭]

অর্থাৎ সংশয়ের উপস্থাপন করে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ দ্বারা অর্থাৎ স্বপক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষ খন্ডনের দ্বারা পদার্থের অবধারণ হল নির্ণয়। এই নির্ণয় সূত্রে "বিমৃশ্য" পদের অর্থ হল, 'মধ্যস্থগণের সংশয়ের পর'। সুতরাং মহর্ষি গৌতমের মতে, এই নির্ণয়রূপ পরীক্ষা সংশয়পূর্বক। তবে এইস্থলে উদ্দ্যোতকরের মত অনুসরণ করে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, নির্ণয় মাত্রই সবর্দা সংশয় পূর্বক হবে, এমনটি নয়। যেমন, প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশয় ছাড়াই নির্ণয় হয়ে থাকে, আবার জিগীষাশূন্য গুরু-শিষ্য প্রভৃতি বাদী ও প্রতিবাদী হয়ে যখন কোন বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্য 'বাদ' কথায় প্রবৃত্ত হন, তখন সেখানে মধ্যস্থের আবশ্যক না থাকায়, সেই 'বাদ' কথার দ্বারা যে তত্ত্বনির্ণয় হয়, তা মধ্যস্থের সংশয় পূর্বক হয় না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন নির্ণয় সূত্রের ভাষ্যে এইপ্রসঙ্গে বলেছেন, "বাদে শাস্ত্রে চ বিমর্শবর্জ্যম্" অর্থাৎ বাদকথা ও শাস্ত্রে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা যে অবধারণ হয়, তা সংশয় বর্জিত। কিন্তু শাস্ত্রবাদে যে বিচার তা অবশ্যই সংশয় পূর্বক , এই বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কেননা, সংশয় ছাড়া নির্ণয় হতে পারলেও, বিচার কখনই হতে পরে না। শাস্ত্রাদিতেও যখন বিচার প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, তখন তার পূর্বাঙ্গরূপে সংশয় অবশ্যই থাকে। কারণ বিচারের অবতারণাই সংশয়ের কারণ। সুতরাং সংশয় নির্ণয়রূপ পরীক্ষার অঙ্গ না হলেও, নির্ণয়ার্থ বিচারের পূর্বাঙ্গ। কেননা, নির্ণয়ের জন্য বিচার করতে হলে পক্ষপ্রতিপক্ষ গ্রহণ করেই করতে হয়, আর একথা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, পক্ষপ্রতিপক্ষ গ্রহণ করতে হলে সংশয় আবশ্যক। সুতরাং 'পরীক্ষা' বলতে যদি বিচার-কে বোঝা হয় তাহলে, পরীক্ষা মাত্রই সংশয় পূর্বক , এ কথা বলা যাতে পারে। ন্যায়কন্দলীকারও পরীক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন,

"লক্ষিতস্য যথা লক্ষণং বিচারঃ পরীক্ষা"।।[৮]

অর্থাৎ ন্যায়কন্দলীকার পরীক্ষাকেই বিচার বলেছেন। 'পরি' শব্দের অর্থ সম্যকরূপে এবং 'ঈক্ষা' শব্দের অর্থ নির্ণয়, অর্থাৎ যে যুক্তি বা বিচারের দ্বারা সর্বতো ভাবে ঈক্ষা বা নির্ণয় জন্মায়, তাই হলো পরীক্ষা। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেই ন্যায়কন্দলীকার 'পরীক্ষা' শব্দের দ্বারা যুক্তি বা বিচারকেই বুঝিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরীক্ষা মাত্রই যে সংশয় পূর্বক এবং সংশয় হল সর্ব পরীক্ষার ব্যপক , এর স্পষ্ট নিদর্শন মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায়সূত্রের পরীক্ষা প্রকরণে পাওয়া যায়। মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মোক্ষ লাভের উপযোগী ষোড়ষ প্রকার পদার্থের পরীক্ষা করতে গিয়ে, ষোড়শ পদার্থের ক্রম অনুসারে, প্রথমে প্রমাণ অথবা প্রমেয়ের পরীক্ষা না করে, সর্বাগ্রে সংশয় নামক তৃতীয় প্রকার পদার্থের পরীক্ষা করেছেন। কারণ সংশয় সকল পরীক্ষার পূর্বাঙ্গ। প্রথমে প্রমাণ অথবা প্রমেয় পদার্থের পরীক্ষা করতে গেলে, সর্বাগ্রে প্রমাণ অথবা প্রমেয় বিষয়ে সংশয় প্রদর্শন করা প্রয়োজন। আর সংশয় প্রদর্শন করতে গেলে কি কারণে সংশয় জন্মাচ্ছে তারও স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন , এটি করতে গেলে সর্বাগ্রে সংশয়েরই পরীক্ষা প্রয়োজন। এইজন্যই

মহর্ষি ন্যায়সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরীক্ষা প্রকরণের সূচনাতে সংশয়ের পরীক্ষাই করেছেন। তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র মহর্ষি গৌতমের মতকেই সমর্থন করে বলেছেন, আর্থক্রমানুসারে সংশয়ই সকল পদার্থের পূর্ববর্তী। এইস্থলে ক্রম সম্পর্কে সামান্য আলোচনা প্রয়োজন। ক্রম সাধারণতঃ ছয় প্রকার। যে ক্রম শব্দবোধ্য অর্থাৎ শব্দের দ্বারা যা পরিব্যাপ্ত তা শাব্দক্রম -এটিই সর্বাপেক্ষা বলবান। এরপর আর্থক্রম অর্থাৎ আর্থক্রম দ্বিতীয়, পাঠক্রম তৃতীয়, স্থানক্রম চতুর্থ, মুখ্যক্রম পঞ্চম, প্রবৃত্তিকক্রম ষষ্ঠ। ষড়বিধ এই ক্রমের মধ্যে প্রথম ক্রমটি সর্বাপেক্ষা সবল, তার পরের ক্রমগুলি পর পর দুর্বল। অর্থাৎ পাঠক্রমের থেকে আর্থক্রম বলবান। অর্থ পর্যালোচনা দ্বারা যে ক্রম বোঝা যায় তা আর্থক্রম। এই আর্থক্রম পাঠক্রমের বাধক। ন্যায়সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরীক্ষা প্রকরণে মহর্ষি প্রথম ন্যায়সূত্রের (১/১/১) উদ্দেশ্যক্রম অর্থাৎ পাঠক্রম ত্যাগ করে, আর্থক্রম অনুসারে সর্বাগ্রে সংশয়কেই পরীক্ষা করেছেন। কেননা, পূর্বেই উক্ত হয়েছে - আর্থক্রম পাঠক্রমের বাধক। প্রথম ন্যায়সূত্রে 'প্রমাণ ও প্রমেয়ের পর সংশয়'- এই পাঠক্রম থাকলেও, আর্থক্রম অনুসারে - পরীক্ষামাত্রই সংশয় পূর্বক। সেই কারণেই মহর্ষি গৌতম পরীক্ষারম্ভে সবার প্রথমে সংশয় পদার্থেরই পরীক্ষা করেছেন। সুতরাং সারকথা হল, সংশয় ব্যতীত কোন পরীক্ষা তথা কোন প্রকার আলোচনাই সম্ভব হয় না। তাহলে এই বিচারে, সংশয় ন্যায়দর্শনের মুখ্য প্রয়োজন মোক্ষ বিষয়ক আলোচনার আদ্যস্থল, একথা অবশ্য স্বীকার্য। কেননা, যেহেতু সংশয় সকল বিচার তথা আলোচনার পূর্ববর্তী, সেহেতু সংশয়ের উপস্থাপনা ব্যতিরেকে মোক্ষ সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই সম্ভব নয়। সুতরাং মোক্ষের স্বরূপ ও মোক্ষ লাভের পন্থার আলোচনায় অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজনের আলোচনায় মহর্ষি গৌতম স্বীকৃত সংশয় নামক পদার্থের গুরুত্ব অপরিসীম।

সংশয়ের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন ন্যায় মতের পূর্বে আচার্য্য অন্নংভট্ট ও শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননভট্টাচার্য্য ব্যাখ্যাত সংশয় সম্পর্কীয় আলোচনার প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। কারণ, আচার্য্য অন্নংভট্ট ও বিশ্বনাথ সংশয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকাংশেই প্রাচীন মত অনুসরণ করেছেন। আচার্য্য অন্নংভট্ট সংশয়কে একপ্রকার অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সংশয়ের স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

"একস্মিন ধর্মিণি বিরূদ্ধনানাধর্মবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানং সংশয়ঃ" ।।[৯]

অর্থাৎ একটি ধর্মীতে বিরূদ্ধ নানা ধর্ম প্রকারক জ্ঞান সংশয়। লক্ষণটির স্পষ্টীকরণের জন্য, 'ধর্মী' ও 'বিরূদ্ধধর্ম' বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। যে অধিকরণে বিরূদ্ধ ধর্মসমূহের জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণকে ধর্মী বলে এবং একই সময়ে, একই পদার্থে, যে সকল ধর্ম থাকে না বা থাকতে পারে না সেই সকল ধর্মকে ঐ পদার্থের বিরূদ্ধ ধর্ম বলে। কোন পদার্থ একই সময় একাধিক বিরূদ্ধ ধর্মের আশ্রয় রূপে জ্ঞাত হলে, ঐ জ্ঞানকে সংশয় বলে। আচার্য্য অন্নংভট্ট সংশয়ের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষো বা" অর্থাৎ এটি স্থাণু অথবা পুরুষ , এইরূপ জ্ঞান সংশয়। দূরস্থিত কোন বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলে বিশেষ ধর্মের দর্শন না হওয়ায় এবং সাধারন ধর্মের দর্শন হওয়ায় , 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষো বা' এইরূপ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানই সংশয়। দূরবর্তী স্থানে একটিই বস্তু থাকায় ধর্মী একটি কিন্তু তাতে 'স্থাণুত্ব' ও 'পুরুষত্ব' , রূপ দুটি বিরূদ্ধ ধর্মের জ্ঞান হচ্ছে। 'স্থাণুত্ব' ও 'পুরুষত্ব' - এই দুটি পরস্পর বিরূদ্ধ ধর্ম। কারণ, তারা কোন পদার্থে একই সময়ে একই সাথে থাকতে পারে না। কিন্তু তার সত্ত্বেও উক্ত উদাহরণস্থলে 'স্থাণুত্ব' ও 'পুরুষত্ব' এই দুটি পরস্পর বিরূদ্ধ ধর্ম একই দূরবর্তী ধর্মীতে প্রতীয়মান হচ্ছে এবং ঐ পরস্পর বিরূদ্ধ ধর্মদ্বয় থেকেই 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষো বা' এইরূপ সংশয় উৎপন্ন হচ্ছে। অর্থাৎ সংশয়ের ক্ষেত্রে যে বস্তুটি সম্পর্কে সন্দেহ হচ্ছে অর্থাৎ যা সন্দিগ্ধ বস্তু, সেই বস্তুটির স্বরূপ প্রসঙ্গে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। অন্যভাবে বলা যায়, সংশয়ে জ্ঞানের বিষয়টিকে অবাধিত বা যথাবস্থিত জ্ঞেয় বলা যায় না এবং সেই কারণ বশতই সংশয় প্রমাণ হতে পারে না। কারণ প্রমাণ হল, প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায় বা করণ, এবং প্রমা হল যথার্থ জ্ঞান যা সর্বতোভাবে বিষয় অনুসারী। প্রসঙ্গত এইস্থলে প্রমা, বিপর্যয়, তর্ক এবং অনধ্যবসায়ের সহিত সংশয়ের প্রভেদ সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলা যেতে পারে। প্রমা হল যথার্থ জ্ঞান। দৃশ্যমান বিষয় যে ধর্ম বিশিষ্ট অনুভব যদি সেই

বিষয়টিকে, সেই ধর্ম বিশিষ্টরূপেই প্রকাশ করে তাহলে সেই অনুভব হল যথার্থ অনুভব বা প্রমা। অর্থাৎ প্রমা হল অবাধিত এবং সর্বতভাবে বিষয় অনুসারী। বিপর্যয় হল মিথ্যাজ্ঞান বা বাধিত জ্ঞান। যা পূর্বে অবাধিতরূপে জ্ঞাত হলেও, প্রকৃত সত্যের উন্মোচনে তা বাধিত হয়ে পরে। বিপর্যয়রূপ জ্ঞানকে ভ্রান্তজ্ঞান বা ভ্রমও বলা হয়ে থাকে। বিপর্যয় স্থলে বিশেষ্যে যে বিশেষণের জ্ঞান হয়, তা পরবর্তীকালে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হলেও, সেই সময়ে ঐ জ্ঞানটি নিশ্চিতরূপেই হয়ে থাকে এবং নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হিসাবেই তার ব্যবহারও হয়ে থাকে। এইস্থলেই সংশয়ের সহিত বিপর্যয়ের প্রভেদ। কারণ, সংশয়স্থলে একটি ধর্মীতে একাধিক বিরূদ্ধ ধর্মের আরোপ হয়, এই আরোপ নিশ্চায়াত্মক নয়। অর্থাৎ সংশয়রূপ জ্ঞানস্থলে বিশেষ্য বা ধর্মী একটি থাকে কিন্তু ধর্ম একাধিক থাকে। কিন্তু বিপর্যয় স্থলে তা হয় না। কারণ, বিপর্যয় স্থলে ধর্মী বা বিশেষ্যে একটিই ধর্ম বা বিশেষণের নিশ্চয় ঘটে, যদিও পরবর্তীকালে আসল সত্যের উন্মোচনে এই নিশ্চয় ভঙ্গ হয়। তর্ক একপ্রকার অযথার্থ, আরোপাত্মক জ্ঞান। তর্ক প্রমাণ নয়, তর্ক স্বয়ং অপ্রমাণ, কিন্তু তা প্রমাণের অনুগ্রাহক বা সহকারী জ্ঞান। কারণ, তর্ক প্রমাজনক প্রতিবন্ধকতা দূর করে, প্রমাণের দ্বারা প্রমার উৎপত্তিতে সহায়ক হয়। তর্ক একপ্রকার আরোপাত্মক জ্ঞান হওয়ার কারণে তর্কে, একটি কোটির নিশ্চিতরূপে জ্ঞান হয়ে থাকে। এইস্থলেই সংশয়ের সঙ্গে তর্কের প্রভেদ। কারণ, সংশয়রূপ জ্ঞানস্থলে কখনই একটি কোটির জ্ঞান হয় না। সংশয়রূপ জ্ঞানে পরস্পর বিরূদ্ধ কোটির জ্ঞান অনিবার্য । এইবিচারে ‘তর্ক’ সংশয়রূপ জ্ঞান হতে ভিন্ন। অনধ্যবসায় হল, কোন পূর্ব জ্ঞাত বা পূর্বে অজ্ঞাত বিষয়ে অনাগ্রহবশতঃ তএটি কি জানি কি ?দ - এইরূপ জ্ঞান। অনধ্যবসায়রূপ জ্ঞান স্থলে, জ্ঞানীয় বিষয়ের স্বরূপ নিশ্চয় না হওয়ায় অনধ্যবসায়াত্মক জ্ঞান একপ্রকার অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। এই অনধ্যবসায়-রূপ অবিদ্যাত্মক জ্ঞানকে অনেক দর্শন সম্প্রদায় ‘সংশয়’-রূপ অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কিন্তু সংশয় ও অনধ্যবসায় - এই উভয় জ্ঞান অনিশ্চয়াত্মক হলেও, এই দুটি অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের মধ্যে কারণগত, বিষয়গত ও স্বরূপগত প্রভেদ বর্তমান। সংশয়রূপ অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের ক্ষেত্রে, উভয়কোটির যে অসাধারণ ধর্ম তার স্মরণ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু এইরূপ স্মরণ অনধ্যবসায়ের জন্য আবশ্যক নয়। এছাড়াও অনধ্যবসায়রূপ অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষেত্রে ‘বিষয়ের প্রতি অনাগ্রহ’ কারণ হয়ে থাকে, কিন্তু সংশয়ের ক্ষেত্রে ‘বিষয়ের প্রতি অনাগ্রহ’ থাকে না, বরং বিষয়ের প্রতি সংশয়কর্তার আগ্রহই কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং এইবিচারে সংশয় ও অনধ্যবসায়ের মধ্যে কারণগতভেদ স্পষ্ট। সংশয় নামক অবিদ্যাত্মক জ্ঞান সর্বদা প্রসিদ্ধ বা জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কেই হয়ে থাকে। কিন্তু অনধ্যবসায়রূপ জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ বা অজ্ঞাত বিষয়েও হয়ে থাকে। এইবিচারে অনধ্যবসায় ও সংশয়ের মধ্যে বিষয়গত ভেদ স্পষ্ট। আবার সংশয় ও অনধ্যবসায়ের মধ্যে স্বরূপগত ভেদও বর্তমান। কারণ, অনধ্যবসায় হল বিশেষ সংজ্ঞার উল্লেখরহিত জ্ঞানবিশেষ। কিন্তু সংশয়ে বিশেষ সংজ্ঞার উল্লেখ থাকে। এইবিচারে অনধ্যবসায় ও সংশয়ের মধ্যে স্বরূপগত ভেদ স্পষ্ট।

এবার মূল আলোচনায় ফিরে আসা যাক। আচার্য্য অন্নংভট্ট কৃত সংশয়ের ব্যাখ্যায় একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, তিনি সংশয়ের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে প্রাচীন নৈয়ায়িক মত অনুসরণ করে, সংশয়কে বিরূদ্ধ ভাবকোটিক রূপেই বর্ণনা করেছেন। কারণ, অন্নংভট্ট উল্লিখিত সংশয়ের ধর্মীতে, ‘স্থাণুত্ব’ ও ‘পুরুষত্ব’ - রূপে দুটি বিরূদ্ধ ভাবপদার্থের জ্ঞান হয়েছে। প্রসঙ্গত এইস্থলে, সংশয় ‘ভাবকোটিক নাকি ভাবাভাবকোটিক’ এই বিষয়ে - প্রাচীন নৈয়ায়িক ও নব্য নৈয়ায়িকগণের মধ্যে মতভেদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাচীন মতে, সংশয়ের কোটি বিরূদ্ধ ভাবপদার্থই হয়। যেমন, পূর্বোক্ত উদাহরণে অর্থাৎ ‘অয়ং স্থার্ণুবা পুরুষো বা’ , এই সংশয় স্থলে ‘স্থাণুত্ব’ ও ‘পুরুষত্ব’ এই কোটিদ্বয় পরস্পর বিরূদ্ধ ভাবপদার্থ। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষন করেন। নব্য মতে, বিরূদ্ধ ভাব ও অভাব পদার্থই সংশয়ের কোটি হয়। সুতরাং তাঁরা ‘বিরূদ্ধ ভাবাভাবকোটিক সংশয়’ স্বীকার করেন। নব্য নৈয়ায়িক মতে, সংশয়ের চারটি কোটি বর্তমান। পুর্বোক্ত উদাহরণের নিরিখে বলতে গেলে বলতে হবে, উক্ত সংশয়স্থলে নব্য মতানুযায়ী স্থাণুত্ব ও স্থাণুত্বভাব এবং পুরুষত্ব ও পুরুষত্বভাব , এই ভাবাভাব চতুষ্কোটিই বর্তমান। এই ভাবাভাবকোটি অনুযায়ী নব্যমতে, সংশয়ের আকার হবে , তঅয়ং স্থার্ণুন বা অয়ং পুরুষো ন বাদ। নব্য নৈয়ায়িকগণ এইভাবে বিরূদ্ধ ভাবাভাবকোটিক সংশয় স্বীকার করেন। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িক আচার্য্য অন্নংভট্ট তাঁর ‘তর্কসংগ্রহ’ গ্রন্থে সংশয়ের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন নৈয়ায়িক মত অনুসরণ করে

সংশয়কে - বিরূদ্ধ ভাবকোটিক রূপেই বর্ণনা করেছেন। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননভট্টাচার্য্য-ও সংশয়য়ের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকাংশে প্রাচীন নৈয়ায়িক মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ সংশয়ের স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলেছেন,

"একধর্মিকবিরুদ্ধভাবাভাবপ্রকারকং জ্ঞানং সংশয়"।।[১০]

অর্থাৎ একই অধিকরণে পরস্পর বিরূদ্ধ ভাব এবং অভাবপ্রকারক জ্ঞানকে বলে সংশয়। সংশয়ের উদাহরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'এটি নর অথবা স্থাণু' ইত্যাদি বুদ্ধিকে সংশয় বলে। এখানেও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সংশয়-ভাবকোটিক অথবা অভাবকোটিক অথবা ভাবাভাবকোটিক - এই বিষয়ে, শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ প্রাচীনন্যায় ও নব্যন্যায়-উভয় মতকেই গ্রহণ করেছেন। কেননা, শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ সংশয়ের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে নব্যমত স্বীকার করে সংশয়কে বিরুদ্ধভাবাভাবকোটিক বলেছেন, আবার সংশয়ের উদাহরণ প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীনন্যায় অনুসারে সংশয় বিরূদ্ধভাবকোটিক বলে বর্ণনা করেছেন। শুধুমাত্র সংশয়ের কোটি বিষয়ক আলোচনাতেই নয়, সংশয়ের বিভাজন প্রসঙ্গেও শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ মহর্ষি গৌতমের মত অনুসরণ করে, পাঁচ প্রকার কারণ জন্য সংশয়কে পাঁচ প্রকার হিসাবেই গণ্য করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে - নব্য নৈয়ায়িক আচার্য অন্নংভট্ট ও শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ সংশয় আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকাংশে প্রাচীন মত অনুসরণ করেছেন। এবার প্রাচীন নৈয়ায়িকের সংশয় প্রসঙ্গে দৃষ্টিপাত যাক।

প্রাচীন নৈয়ায়িক মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে সংশয় পদার্থ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ন্যায়সূত্রে তিনি কেবল সংশয়ের লক্ষণই প্রদান করেননি, তার সঙ্গে সংশয়ের বিভিন্ন বিভাগেরও উল্লেখ করেছেন। সংশয় প্রসঙ্গে মহর্ষি বলেছেন,

"সমানানেকধর্ম্মোপপত্তের্বিপ্রতিপত্তেরূপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ

বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ"।।[১১]

মহর্ষি উক্ত এই সংশয়সুত্রে 'সংশয়' পদের দ্বারা সংশয়-লক্ষণের লক্ষ্যস্থল সূচিত হয়েছে। লক্ষণস্থিত 'বিমর্শঃ' পদের দ্বারা মহর্ষি সংশয়ের সামান্য লক্ষণ - কোন এক পদার্থে বিরূদ্ধ নানা পদার্থের যে জ্ঞান তা সংশয় , এটির প্রস্তাব করেছেন। কারণ, 'বি' পদের অর্থ বিরোধ এবং 'মৃশ' ধাতুর অর্থ জ্ঞান , এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'বিমশ' পদের অর্থ 'বিরূদ্ধ পদার্থের জ্ঞান'। লক্ষণে 'বিশেষাপেক্ষঃ' পদের দ্বারা, বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি সংশয়ের প্রতিবন্ধক কিন্তু সেই বিশেষ ধর্মের স্মরণ সংশয়ের ক্ষেত্রে আবশ্যক , এটিই সূচিত হয়েছে। এবং লক্ষণস্থিত 'সামানানেকধর্ম্মোপপত্তেঃ' ইত্যাদি পঞ্চম্যন্ত পদত্রয়ের দ্বারা মহর্ষি সংশয়ের পাঁচটি প্রকারের সূচনা করেছেন। মহর্ষির মতে, পাঁচপ্রকার বিশেষ কারণের জন্য সংশয় পাঁচপ্রকার। তাহল , সামান্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য সংশয়, অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য সংশয়, বিপ্রতিপত্তিবাক্য জন্য সংশয়, উপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য সংশয় এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য সংশয়। মহর্ষি উক্ত সংশয়ের স্পষ্টরূপে অনুধাবনের জন্য এই পাঁচপ্রকার সংশয়ের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

মহর্ষি উক্ত প্রথম প্রকার সংশয় হল , সামান্যধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞান জন্য সংশয়। সামান্যধর্ম বলতে মহর্ষি সাধারন ধর্মকেই বুঝিয়েছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মহর্ষি কথিত এইপ্রকার সংশয়ের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন - "স্থাণুপুরুষয়োঃ সমানং ধর্ম্মমারোহপরিনাহৌ পশ্যম্... ইত্যাদি"[১২] অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে কোন ব্যক্তির দূর থেকে পুরুষের মতো স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কোন স্থাণুর (শাখাপল্লবশূন্য বৃক্ষ) সঙ্গে অথবা ঐরূপ কোন পুরুষের সঙ্গে চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলে, সেই ব্যক্তি যদি স্থাণুর অথবা পুরুষের বিশেষ ধর্ম দর্শন না করে, কিন্তু ঐ ধর্মীতে স্থাণু ও পুরুষের সামান্য ধর্ম বা সাধারন ধর্ম, আরোহ ও পরিণাহ অর্থাৎ দৈঘ্য ও বিস্তৃতি - দর্শন করে, তাহলে ঐ ব্যক্তির সম্মুখীন ঐ ধর্মীতে 'এটি কি স্থাণু অথবা পুরুষ ?' এইরূপ সংশয় জন্মায়। এইক্ষেত্রে স্থাণু ও পুরুষের সাধারন ধর্ম আরোহ ও পরিণাহ , এর দর্শনই মহর্ষি কথিত এই প্রথম প্রকার সংশয়ের কারণ। এইস্থলে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সম্মুখীন সেই ধর্মীতে 'স্থাণুত্ব' অথবা 'পুরুষত্ব' প্রভৃতি কোন বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় হয়ে গেলে তখন কিন্তু ঐ ব্যক্তির আর ঐরূপ সংশয় হতো না। কেননা, বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় সবসময় সংশয়ের প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। তবে বিশেষ ধর্মের নিশ্চয়

সংশয়ের প্রতিবন্ধক হলেও বিশেষ ধর্মের স্মরণ সংশয়ের ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক। তাই মহর্ষি সকল প্রকার সংশয়কে 'বিশেষাপেক্ষঃ' বলেছেন।

মহর্ষি কথিত দ্বিতীয় প্রকার সংশয় হল, অসাধারণধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞান জন্য সংশয়। অসাধারণধর্ম হল সেই ধর্ম যা কোন পদার্থকে তার সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থ থেকে পৃথক করে। যেমন, গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম, কেননা, এই ধর্মটি দ্রব্যত্বরূপে পৃথিবীকে তার সজাতীয় জলাদি দ্রব্য থেকে এবং বিজাতীয় গুণ ও কর্ম পদার্থ থেকে পৃথক করে। মহর্ষি এইরূপ অসাধারণধর্ম-কেই দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ের কারণ বলেছেন। এইপ্রকার সংশয়ের উদাহরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য। শব্দের অসাধারণধর্ম শব্দত্ব। এই শব্দত্ব ধর্মটি আত্মা ইত্যাদি কোন নিত্য পদার্থেও থাকে না আবার অনিত্য পদার্থ ঘট, পট ইত্যাদিতেও থাকে না, শব্দত্ব কেবল শব্দে থাকে। শব্দত্ব ধর্মটি নিত্যানিত্যব্যাবৃত্ত হয় বলে, শব্দত্বরূপ অসাধারণধর্মের জ্ঞান থেকে 'শব্দ নিত্য অথবা অনিত্য', এইরূপ সংশয় জন্মায়। এইপ্রকার সংশয়ই হল মহর্ষি কথিত দ্বিতীয় প্রকার সংশয়।

মহর্ষি সংশয় সূত্রে তবিপ্রতিপত্তেঃদ শব্দের দ্বারা তৃতীয় প্রকার সংশয়ের সূচনা করেছেন। তবিরূদ্ধা প্রতিপত্তিঃদ - এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'বিপ্রতিপত্তি' শব্দের মুখ্য অর্থ হল বিরূদ্ধ নিশ্চয়। অর্থাৎ কোন একই পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন বাদীর বিরূদ্ধ নানা পদার্থের নিশ্চয় হল বিপ্রতিপত্তি। যেমন, কোন বাদীপক্ষ এমন নিশ্চয় করেন যে , নিত্য আত্মা আছে, আবার অপর কোন বাদীপক্ষ এমন নিশ্চয় করেন যে , নিত্য আত্মা নেই। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব পরস্পর দুটি বিরূদ্ধধর্ম। বাদী ও প্রতিবাদীর এইরূপ বিরূদ্ধ নিশ্চয়াত্মাক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত বাক্যই হল বিপ্রতিপত্তি বাক্য। বিপ্রতিপত্তি শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে কেবল 'বিরূদ্ধ নিশ্চয়' অর্থে মহর্ষি তাঁর সংশয় সূত্রে তবিপ্রতিপত্তেঃদ শব্দের প্রয়োগ করেননি। বরং বাদী ও প্রতিবাদীর বিরূদ্ধ নিশ্চয়াত্মক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত বাক্যই - মহর্ষি উক্ত ''বিপ্রতিপত্তেঃ'' শব্দের দ্বারা লক্ষিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন,

''সামানেঞ্চধিকরণে ব্যাহতার্থৌ প্রবাদৌ বিপ্রতিপত্তিশব্দস্যার্থঃ''।।[১৩]

সুতরাং বাদী ও প্রতিবাদীর বিরূদ্ধ নিশ্চায়াত্মাক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত বাক্যই হল বিপ্রতিপত্তি বাক্য। এবং এই বিপ্রতিপত্তি বাক্য-কেই মহর্ষি তৃতীয় প্রকার সংশয়ের কারণ বলেছেন। যেমন, শব্দের নিত্যানিত্যত্ব-বিচারে, কোন বাদীপক্ষের সিদ্ধান্ত শব্দ নিত্য আবার অপর কোন বাদীপক্ষের সিদ্ধান্ত শব্দ নিত্য নয়। এই বাদী ও প্রতিবাদীর বিরূদ্ধ নিশ্চায়াত্মাক বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত, 'শব্দো নিত্যো ন বা' - এইরূপ বাক্যই বিপ্রতিপত্তি বাক্য। এই বিপ্রতিপত্তি বাক্য শ্রবণ করে মধ্যস্থের শব্দরূপ ধর্মীতে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ উভয় কোটিদ্বয়ের জ্ঞান হয় এবং তার ফলেই মধ্যস্থের - শব্দ নিত্য কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মায়। এইপ্রকার সংশয়ই হল মহর্ষি কথিত তৃতীয় প্রকার সংশয়।

মহর্ষি গৌতম উক্ত চতুর্থ প্রকার সংশয় হল - উপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য সংশয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে, সূত্রোক্ত উপলব্ধি শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি এবং অব্যবস্থা শব্দের অর্থ নিয়মের অভাব অর্থাৎ অনিয়ম। সমস্ত ক্ষেত্রেই যে, কেবল বিদ্যমান অর্থাৎ অস্তিত্বশীল পদার্থেরই উপলব্ধি হবে এবং অবিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি হবে না , এমন কোন নিয়ম নেই। কেননা বিদ্যমান পদার্থের যেমন প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হয় তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে অবিদ্যমান পদার্থেরও প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হয়ে থাকে। যদিও সেই প্রত্যক্ষ ভ্রমাত্মক হয়ে থাকে কিন্তু তবুও সেইসময় ঐ অবিদ্যমান পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হয়ে থাকে। যেমন, পুষ্করিণীতে বিদ্যমান জলের যেমন প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হয়, তেমনই আবার মরীচিকায় - যেখানে কখনই জল থাকে না সেখানেও ভ্রমবশত অবিদ্যমান জলের প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হয়ে থাকে। সুতরাং 'বিদ্যমান পদার্থের ন্যায় ক্ষেত্র বিশেষে অবিদ্যমান পদার্থেরও প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হয়', যে ব্যক্তি এইরূপ অব্যবস্থা বা অনিয়ম সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন, সেইব্যক্তি যখন কোন স্থানে কোন পদার্থকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তখন যদি ঐ পদার্থের বিদ্যমানত্ব অথবা অবিদ্যমানত্ব যেকোন একটি বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না হয়, তখন ঐ ব্যক্তির সংশয় জন্মায় যে, 'আমি কি বিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি করছি নাকি অবিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি করছি?'। এইরূপ

সংশয়ই মহর্ষি কথিত উপলব্ধির অব্যবস্থার জন্য চতুর্থ প্রকার সংশয়।

মহর্ষি গৌতম উক্ত পঞ্চম প্রকার সংশয় হল - অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য সংশয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, উপলব্ধি শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধি। সুতরাং অনুপলব্ধি শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধির অভাব বুঝতে হবে। অব্যবস্থা শব্দের অর্থ অনিয়ম। সমস্ত ক্ষেত্রেই যে, কেবল অবিদ্যমান অর্থাৎ অনস্তিত্বশীল পদার্থেরই অনুপলব্ধি হবে এবং বিদ্যমান পদার্থের অনুপলব্ধি হবে না , এমন কোন নিয়ম নেই। অর্থাৎ কোন পদার্থের অনুপলব্ধি হলে, যে অনুপলব্ধ পদার্থটি সেখানে নেই , এমন কথা বলা যায় না। কেননা সব ক্ষেত্রেই যে, কেবল অবিদ্যমান পদার্থের অনুপলব্ধি হয় তা নয়। বিদ্যমান পদার্থেরও ক্ষেত্র বিশেষে অনুপলব্ধি হয়ে থাকে। যেমন , মাটির নিচে বিদ্যমান অনেক পদার্থ, যেমন- জল, পাথর, বালি ইত্যাদি প্রত্যক্ষযোগ্য দৃশ্য দ্রব্য হলেও, মাটির নিচে থাকার কারণে সেগুলির অনুপলব্ধি হয়। কিন্তু এইরকম হলেও কখনই বলা যায় না যে - অনুপলব্ধ পাথর, জল, বালি ইত্যাদি মাটির নিচে বিদ্যমান নয়। সুতরাং ‘অবিদ্যমান পদার্থের ন্যায় ক্ষেত্র বিশেষে বিদ্যমান পদার্থেরও অনুপলব্ধি হয়’ , যে ব্যক্তি এইরূপ অব্যবস্থা বা অনিয়ম সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন, সেই ব্যক্তির যদি কোন স্থানে কোন পদার্থের অনুপলব্ধি হয় এবং যদি ঐ পদার্থের বিদ্যমানত্ব অথবা অবিদ্যমানত্ব যেকোন একটি বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় না ঘটে, তখন ঐ ব্যক্তির সংশয় জন্মায় যে - ‘আমি কি অবিদ্যমান পদার্থের অনুপলব্ধি করছি নাকি বিদ্যমান পদার্থের অনুপলব্ধি করছি ?’। এইরূপ সংশয়ই মহর্ষি কথিত অনুপলব্ধির অব্যবস্থার জন্য পঞ্চম প্রকার সংশয়।

সুতরাং ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মহর্ষি গৌতম উক্ত সংশয়ের সম্পূর্ণ লক্ষণটির অর্থ হল- সামান্যধর্মবিশিষ্টধর্মীর জ্ঞানজন্য, অসাধারণধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য, বিপ্রতিপত্তিবাক্য জন্য, উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য - বিশেষ ধর্মের অনুপলব্ধি বশত অথচ সেই বিশেষ ধর্মের স্মরণ জন্য, একই পদার্থে যে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান হয়, তাই হল সংশয়। প্রসঙ্গত এইস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যেভাবে মহর্ষি গৌতমের সংশয় লক্ষণসূত্র ব্যাখ্যা করে, সংশয়ের পাঁচটি কারণের নির্দেশ করেছেন - ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর তা স্বীকার করেন না। উদ্দ্যোতকরের মতে, সংশয় পাঁচ প্রকার নয় বরং সংশয় তিন প্রকার। তিনি উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা - কে পৃথক ভাবে কোন বিশেষ প্রকার সংশয়ের কারণ হিসাবে স্বীকার করে না। তাঁর মতে, উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা , মহর্ষি উক্ত সামান্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মীরজ্ঞান জন্য, অসাধারণধর্মবিশিষ্ট ধর্মীরজ্ঞান জন্য এবং বিপ্রতিপত্তিবাক্য জন্য - এই ত্রিবিধ সংশয়েরই সামান্য কারণ। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর ‘উপলব্ধির অব্যবস্থা’ বলতে, একতর পক্ষের সাধক প্রমাণের অভাবকে বুঝিয়েছেন এবং ‘অনুপলব্ধির অব্যবস্থা’ বলতে বাধক প্রমাণের অভাবকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, এই একতর পক্ষের সাধকপ্রমাণের অভাব ও বাধক প্রমাণের অভাব উভয়ই সংশয়ের সামান্য কারণ। কেননা, সংশয়ের একতর কোটির সাধকপ্রমাণ অথবা বাধকপ্রমাণ উপস্থিত হলে, সে বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হয় না। তাই ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরের মতে সংশয় কেবল তিন প্রকার, তাহল— সামান্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য সংশয়, অসাধারণধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য সংশয় এবং বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য সংশয়। কেবলমাত্র উদ্দ্যোতকরই নয়, আচার্য্য শঙ্কর মিশ্রও ভাষ্যকার বাৎসায়নের ব্যাখ্যাত সংশয়ের বিভাগকে অস্বীকার করেছেন। আচার্য্য শঙ্কর মিশ্র এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

“তথা চ সংশয়ো ন ত্রিবিধো ন বা পঞ্চবিধঃ কিন্ত্বেকবিধ এব”।।[১৪]

তাঁর মতে, সংশয় পাঁচ প্রকার নয়। তিনি যুক্তি দিয়ে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এবং উদ্দ্যোতকর উভয় মতকে খন্ডন করে দেখিয়েছেন, সংশয় কেবল একটি কারণ দ্বারাই হয়। অচার্য্য শঙ্কর মিশ্রের যুক্তি হল, যদি কারণের ভেদ বশত সংশয়ের ভেদ স্বীকার করতে হয় তাহলে, যেখানে একটি কারণ থেকে সংশয় উৎপন্ন হয় সেখানে সংশয়ের অপর কারণ না থাকায়, ব্যতিরেক ব্যভিচার বশত ঐ সকল কারণের কারণতা অসম্ভব হয়ে পরে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করেন - সংশয় পাঁচ প্রকার নয়, সংশয় তিন প্রকার নয়, সংশয় কেবলমাত্র এক প্রকার।

সুতরাং, মহর্ষি গৌতমের সংশয় সম্পর্কীয় মতামতের আলোচনার পর এটি অবশ্যই স্পষ্ট হয় যে - মহর্ষি নব্য নৈয়ায়িকদের তুলনায় অনেক বিস্তারিত ভাবে সংশয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এবং এর সাথে এটিও স্পষ্ট হয় যে, নব্য নৈয়ায়িকগণ সংশয়ের আলোচনাতে অনেকাংশে প্রাচীন মতকে অনুসরণ করেছেন।

এবার সংশয়ের মূল্যায়নের আলোচনা প্রসঙ্গে দৃষ্টিপাত করা যাক। সংশয়ের মূল্যায়নের আলোচনায় সংশয়ের স্বরূপ সম্পর্কে দু-ঐকটি প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে। সংশয়স্থলে আমাদের বৈকল্পিকরূপেই জ্ঞান হয়ে থাকে, নিশ্চায়াত্মক রূপে হয় না। দূরস্থিত কোন বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলে বিশেষ ধর্মের দর্শন না হওয়ায় এবং সাধারন ধর্মের দর্শন হওয়ায় 'এটি স্থাণু অথবা পুরুষ', এইরূপ সংশয়াত্মক জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান একপ্রকার বৈকল্পিক জ্ঞান। কারণ, এই জ্ঞানস্থলে প্রকারিভূত দুটি ধর্ম রয়েছে, একটি হল 'স্থাণুত্ব' এবং অপরটি হল 'পুরুষত্ব'। এই প্রকার সংশয়কে শব্দে বা বাক্যে প্রকাশ করার জন্য আমরা 'অথবা' শব্দের ব্যবহার করে বলি , 'এটি স্থাণু অথবা পুরুষ'। সুতরাং এই সংশয়াত্মক অপ্রমা যে কেবল জ্ঞানের ক্ষেত্রে হচ্ছে তাই নয় বরং তা শব্দ ব্যবহারের বা বাক্য ব্যবহরের ক্ষেত্রেও হচ্ছে। কেননা 'এটি স্থাণু অথবা পুরুষ' , এটি একটি বৈকল্পিক বচন। এইস্থলেই প্রশ্ন হতে পারে , বৈকল্পিক-রূপে জ্ঞান হওয়ার জন্য সংশয়কে কি সঠিক অর্থে অপ্রমা বলা যেতে পারে ? কেননা বৈকল্পিক বচনের ক্ষেত্রে, একটি বিকল্প সত্য হলে, সমগ্র বৈকল্পিক বচনটি সত্য হয়। সুতরাং 'এটি স্থাণু অথবা পুরুষ' , এইরূপ সংশয় স্থলে যদি পরবর্তীকালে 'স্থাণুত্ব' অথবা 'পুরুষত্ব' যেকোন একটি বিকল্পের নিশ্চয় ঘটে তাহলে বৈকল্পিক বচনের নিয়ম অনুযায়ী, 'এটি স্থাণু অথবা পুরুষ' , এই সংশয়াত্মক জ্ঞানটিকেও সত্য বলতে হবে। তাহলে এইস্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে, এই সত্য দাবিটিকেও কি প্রমার মর্যাদা দেওয়া যায় না ?।

এই যুক্তিটিকে একটু ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে - সংশয় স্থলে অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, সংশয় কালে সংশয়স্থলের বিশেষ্যাংশে বা ধর্মী অংশে যে সকল বিরূদ্ধকোটির জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, পরবর্তীকালে সংশয় নিরসন হলে দেখা গেল যে, ঐ পূর্ব উল্লিখিত কোন কোটিরই নিশ্চয় ঘটল না। যেমন - যদি এইরকম সংশয় হয় যে - 'ওটি ধূম অথবা ধূলি' এবং পরবর্তীকালে সংশয় নিরসন হলে দেখা গেল যে, ঐ দূরবর্তী বস্তুটি ধূম অথবা ধূলি কোনটিই ছিল না, আসলে তা ছিল কুয়াশা। এইরূপ সংশয়ের ক্ষেত্রে একতর কোটিরও নিশ্চয় না হওয়ার জন্য, এই সংশয়াত্মক জ্ঞানকে অপ্রমা হিসাবে স্বীকার করা গেলেও, পূর্বোক্ত সংশয় নিরসনের পর যদি ঐ সংশয়াত্মক জ্ঞানের একতর কোটির অর্থাৎ 'ধূমত্ব' অথবা 'ধূলিত্ব' যেকোন একটি কোটির নিশ্চয় ঘটে, তাহলে এইস্থলে প্রশ্ন ওঠে যে, 'ওটি ধূম অথবা ধূলি' - এইরূপ সংশয়াত্মক জ্ঞানকে কি সঠিক অর্থে অপ্রমা বলা যায় ? কারণ, সংশয়ের নিরসনের পর দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বোক্ত দুটি কোটির মধ্যে একটি কোটির নিশ্চয় ঘটছে।

পরিশেষে বলা যায়, অন্ধবিশ্বাসের প্রতি অযৌক্তিক আনুগত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার প্রেক্ষিতে সংশয় ব্যক্তিমানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৈদিক যুগ শুরু থেকে ভগবান বুদ্ধ তথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীগণের প্রত্যেকেই নিঃসংশয়ে কোন বিষয় স্বীকারের বিরোধিতা করেছেন। ন্যায়সূত্র ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মনে করেন, অনুসন্ধান বা যৌক্তিক পরীক্ষণ একমাত্র সংশয়াত্মক বিষয় সম্পর্কেই হতে পারে। যদিও জয়ন্ত ভট্ট প্রমুখের মতানুসারে, সংশয় ব্যতিরেকেও অনুসন্ধানের অবতারনা হওয়া সম্ভব। দৃষ্টান্ত প্রদান করে বলা যায়, জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিৎসা, সিষাধয়িসা বা প্রমাণ করার ইচ্ছা, পরিপ্রচ্ছা বা প্রশ্ন করার মনোভাব বশতও অনুসন্ধান সম্ভব। কিন্তু তাহলেও যেকোন প্রকার যৌক্তিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সংশয়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সংশয় কোন ব্যক্তিকে কোন বিষয় সম্পর্কে অবিলম্বে বিশ্বাসের অবস্থান গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে এবং প্রকৃত সত্যকে নির্ণয় করে। বস্তুতপক্ষে সংশয়ের বশবর্তী হয়েই ব্যক্তি মিথ্যা বিশ্বাস তথা ভ্রান্ত তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কিন্তু এইস্থলে একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষণীয় যে, যৌক্তিক অনুসন্ধানে সংশয় যদিও অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে, কিন্তু বহু সময় সত্য অনুসন্ধানের পথে অবিরাম একই প্রসঙ্গে, একইভাবে সংশয় করে যাওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকারক বা অকার্যকরী হয়ে থাকে। এই জাতীয় অকার্যকরী সংশয় সত্য অনুসন্ধানের পথে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ কারণ, অবিরাম সংশয়িত প্রশ্নের জালে সত্যানুসন্ধান

দিশেহারা হয়ে পড়তে পারে। ভগবদ্গীতায় এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"[১৫] - অর্থাৎ যে আত্মা সর্বদাই সংশয়ের মধ্যে থাকে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সংশয় তখনই কার্যকরীরূপে গণ্য হবে যদি তা কোনো যথার্থ সিদ্ধান্ত লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয় এবং এই অর্থেই সংশয় প্রকৃত জ্ঞানলাভের অথবা জ্ঞানীয় যাচাইকরণের ক্ষেত্রে আদ্যস্থল হতে পারে। সুতরাং সিদ্ধান্তস্বরূপ বলা যায়, সত্যের প্রাপ্তির জন্য যেকোন প্রকার অনুসন্ধানের পূর্বে সংশয়কে নেহাৎই একটি পদ্ধতি রূপে গ্রহণ করা উচিত - লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রূপে নয়। আরো সরল ভাবে বলা যায় যে, সংশয়ের পদ্ধতিগত মূল্য স্বীকৃত হলেও লক্ষ্যগত ভাবে তা মূল্যহীন। নিশ্চিত জ্ঞান লাভের জন্য, নিশ্চিতকে সম্ভাব্য থেকে তথা নিশ্চিতকে অনিশ্চিত থেকে ভিন্ন করে বোঝার জন্যই আলোচনা তথা অনুসন্ধানের প্রারম্ভিক সূচকরূপে সংশয়কে গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু নিশ্চিত জ্ঞান লাভের পর ঐ সংশয়ের আর কোন প্রয়োজন থাকে না এবং তখন ঐ অকারণ,সংশয়ের বর্জন অত্যাবশ্যক , এই সিদ্ধান্ত জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে সতর্কতার সাবধানবাণী। কারণ ধ্বংসমুখি অবিরাম সংশয় সর্বদাই ব্যক্তির জ্ঞানের রাজ্যে ক্ষতের সৃষ্টি করে। সুতরাং দার্শনিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সংশয়কে শর্তসাপেক্ষ, সাময়িক এবং প্রারম্ভিক রূপে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয় তথা কর্তব্য।

তথ্যসূত্র

১. মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত, *ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮১ - ১/১/১ - সূত্র ভাষ্য।

২. *মহাভারত*, সভাপর্ব-৫/৩৫।

৩. মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত, *ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮১- ১/১/১-সূত্র ভাষ্য।

৪. তদেব - ১/১/২-সূত্র।

৫. তদেব - ১/১/১-সূত্র।

৬. *মনুসংহিতা*-৭/৪৩।

৭. মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত, *ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮১ - ১/১/৪১ -সূত্র।

৮. শ্রীদুর্গাধর ঝা-কর্ত্তৃক সম্পাদিত *প্রশস্তপাদভাষ্য*, শ্রীধরভট্ট বিরচিত ন্যায়কন্দলী ব্যাখ্যাসহ, সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, বারানসী, ১৯৯৭, পৃ. ২৬।

৯. শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী কর্ত্তৃক অনূদিত, *সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ* , অধ্যাপনাসহিত, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার-১৪১৩, পৃ. ৫৬৯।

১০. শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত, *ভাষাপরিচ্ছেদঃ, ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*- টীকা সহিতঃ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার-১৯৭০, পৃ. ৪১৫।

১১. মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত, *ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ-১৯৮১-১/১/২৩-সূত্র।

১২. তদেব, *সূত্র ভাষ্য*-১/১/২৩।

১৩. তদেব, ২/১/৬, *সূত্র ভাষ্য*।

১৪. *বৈশেষিক সূত্র*-২/২/১৭, উপস্কার টীকা।

১৫. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-৪/৪০।